মানিকের লাল কাঁকড়া

আনজীর লিটন

পুনশ্চ

প্রাককথন

বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম ১৯ মে ১৯০৮ সাল; ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মা নীরদা দেবী। ভাইবোনের সংখ্যা চোদ্দোজন। আট ভাই ছয় বোনের মধ্যে মানিক পঞ্চম। পৈত্রিক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রাম। বাপ-দাদার আদি নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরের সিমুলিয়া গ্রামে। নানার বাড়ি মালপদিয়ার কাছে গাওদিয়া গ্রামে।

মাত্র ৪৮ বছরের জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অমর এই কালজয়ী কথাশিল্পী আমার কিশোর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ছোটোরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানতে পারবে। জানা মানে শুধু জ্ঞানের ভার বহন করা নয় কিন্তু। জানতে জানতে আনন্দে আপ্লুত হবে। মুগ্ধ হবে। এই কথাশিল্পীকে ভালোবাসবে। এইসব ভাবনার বুদ্বুদ থেকে আমার এই প্রচেষ্টা।

মানিকের পুরো নাম প্রবোধকুমার। গায়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখেই তাকে ডাকা হত কালোমানিক বলে। সেই কালোমানিকের মানিক নামটি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুড়ে আজকের বাংলা সাহিত্যে হলেন অমর কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকের বাবার ছিল বদলির চাকরি-ছ মাস বা দু-এক বছর পরে পরেই তাকে এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে ছুটতে হত। হয়তো

কুমিল্লা থেকে ময়মনসিংহ এবং সেখান থেকে একেবারে টাঙাইল অথবা মেদিনীপুরে। ফলে মানিকের লেখাপড়াও বাঁধাধরা নিয়মে হয়নি। এখানে-ওখানে নানান স্কুলে পড়তে হয়েছে। সমস্ত স্কুল জীবনটাই যেন ছন্নছাড়া। ক্লাসের পড়া খুব ভালো লাগত না। খেলায় ঝোঁক ছিল বেশি। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত। কখনওবা একা বসে বসে চিন্তা করতেন।

লেখাপড়া শুরু হয় কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউট থেকে। সেখান থেকে টাঙ্গাইলে কয়েক বছর তারপর মেদিনীপুর জেলা স্কুল। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ (১৯২৬) হয়ে কলেজে ভরতি হন পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজে। ১৯২৮ সালে এখান থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করেন। ভরতি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অনার্সে। বিষয় অঙ্ক। তার নিজের কথা—'অঙ্কের মতন এমন আর কি আছে? এত জটিলতার এমন চুলচেরা নিয়ম। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা তো অভিনব কাব্য।'

কলেজ জীবনেই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে জেদের বশে ১৯২৮ সালে লেখেন *অতসীমামী* নামের গল্প।

ছোটোদের জন্য লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বই-ই জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। *মাঝির ছেলে* উপন্যাস ষোলো কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়কার ছোটোদের পত্রিকা *মৌচাক*-এ। লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর উদ্যোগে *মাঝির ছেলে* উপন্যাস ও ছোটোদের জন্য লেখা অন্যান্য গল্প নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। পরে তা আর প্রকাশ পায়নি।

ছোটোদের জন্য লেখা অন্য একটি উপন্যাস 'মাটির কাছে কিশোর কবি' সাত কিস্তি লিখেছিলেন ছোটোদের *আগামী* পত্রিকায় (১৩৬০ মাঘ)। পাঁচ বছর পর *আগামী* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মানিকের অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন। এছাড়া মানিকের লেখা বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল সেই সময়কার ছোটোদের কাগজ *মৌচাক*, *আগামী*, *রংমশাল*, *জাগরণ* এবং বিভিন্ন শারদীয় সংকলনে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়ের গল্পই শোনাতে চেয়েছেন ছোটোদের কাছে। ছোটোদের সাহিত্যকে কখনোই তুলতুলে নরম পেলব, ন্যাকামি ভরা শব্দের জাদু দিয়ে ভোলাতে চাননি। বরং মাটি আর মানুষের কথা

বলতে চেয়েছেন। ছোটোদেরও চেনাতে চেয়েছেন মানুষের এক জীবনে থাকা নানান সংঘাতের কথা। এগুলো শক্ত হাতে দমন করে সমাজ সচেতন থাকার প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। এই সচেতনতা তৈরি হয় ছোটোবেলা থেকেই। যে জন্য ছোটোদের লেখায় তুলে ধরতে চান 'বিষয় ও অনুসন্ধিৎসা'। যেভাবে বড়োদের কাছে বড়োদের কথা বলেছেন তেমনি ছোটোদের কাছেও মানিক বলতে চেয়েছেন বড়ো হতে হলে ছোটো থেকেই তৈরি হতে হবে। লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই এসব কথা জানানো যায় না বলেই মানিক কলম ধরেছিলেন।

লেখক হিসেবে মানিক ছিলেন স্বাপ্নিক, আশাবাদী। জীবন ও মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। এ কারণেই লেখক হিসেবে মানিক আমার কাছে এক অনুপম চরিত্র। মানিকের ভেতর দিয়ে আজকের বই পড়ুয়া হাজারো মানিকের বুকের ভেতরের স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। বাস্তব অনেক কঠোর। ইচ্ছা পূরণের অবকাশ এখানে মেলে না। তাই কল্পনা ও কাহিনির কাছে আশ্রয় নিতে হয়। আমার এই আশ্রয়কেই বলব 'মানিকের লাল কাঁকড়া'। মানিকের জীবন-ইতিহাস আমার লক্ষ্য নয়। তার জীবনে যে ভাব, যে বোধ, যে নৈতিক শক্তি দেখতে পাই একেই আমি আমার গন্তব্য ভেবেছি। তাই মানিকের জীবন-চরিত নয়, জীবনের আশাবাদী ভাবটুকুই উপন্যাসে তুলেছি। যার নাম দিয়েছি 'মানিকের লাল কাঁকড়া'। এই গল্প তোমাদের—আজকের মানিকদের।

'মানিকের লাল কাঁকড়া' কিশোর উপন্যাসটি-এর আগে ঢাকার 'অনন্যা' প্রকাশনি থেকে মনিরুল হক প্রকাশ করেছিলেন ২০১২ সালে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সে বছর বইটি সিটি-আনন্দআলো সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে।

পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে 'মানিকের লাল কাঁকড়া' কলকাতার 'পুনশ্চ' প্রকাশনা থেকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পুনশ্চ'র প্রকাশক সন্দীপ নায়ককে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আনজীর লিটন
ঢাকা, বাংলাদেশ
anjirbd@yahoo.com

কয়েকটি চরিত্র আর চরিত্রগুলোর যাপিত জীবন-কাহিনি নিয়েই তো উপন্যাস।

কিন্তু এত চরিত্র পাব কোথায়? আমার ভেতরটা যদি রবীন্দ্রনাথ হয়ে যেত, অনেকগুলো চরিত্রের একটি উপন্যাস পেয়ে যেতাম। কিংবা মনটা যদি নজরুলের মতো বিদ্রোহী হয়ে উঠত, তাও তো একটা বিদ্রোহী চরিত্র খুঁজে পেতাম। আর লিখতাম সেইসব চরিত্রের কথা যারা বলতে জানে, ধান ফুরল পান ফুরল খাজনার উপায় কি? আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

কিংবা আমার মনটা যদি সত্যজিৎ রায় হয়ে যেত? তাহলে তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র নিয়ে কিছু লিখতাম। কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্র? তাদের কাছ থেকে কিশোর উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্র ধার নিতাম। যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদাকে খুঁজে পেতাম। কিংবা অন্য কাউকে?

ছোটোদের পত্রিকা অফিস থেকে ফোন এসেছিল। প্রথমে অনুরোধ, এরপর তাগাদা, প্রায় প্রতিদিন ফোন—লেখাটি হল? আসলে প্রথম যেদিন ওদের ফোন পেলাম, সেইদিন থেকে আমি অস্থিরতায় ভুগছি। ঈদ সংখ্যার জন্য লেখা চাই! তাও গল্প, প্রবন্ধ কিংবা ভ্রমণ কাহিনি নয়, রীতিমতো উপন্যাস। ছোটো আকারের হলে হবে না। মোটামুটি ঢাউস সাইজের উপন্যাস চাই। সেটা হবে কিশোর উপন্যাস। লেখালেখি যখন জীবনের অংশ কবে নিয়েছি তখন বড়োদের আর কিশোরদের তাতে কী যায় আসে। লিখতে

যখন হবেই তাহলে লিখব। কিন্তু কিশোর উপন্যাসে যা লিখব কোথায় খুঁজে পাই এর বিষয়-আশয়! একটা কিশোর উপন্যাস লিখব যে, উপন্যাসের চরিত্রই খুঁজে পাচ্ছি না।

সেই যে কবে, *'ভীমের কপাল'* লিখে কিশোর উপন্যাসের যাত্রা শুরু করে দিয়েছিলেন প্রমাদচরণ সেন। ১৮৮৩ সালের কথা। ধারাবাহিকভাবে দশ কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল 'সখা' পত্রিকায়। ছোটোদের পত্রিকা ছিল সেটি। এ মুহূর্তে ভীমের *কপাল*-এর কথা খুব মনে পড়ছে। কী শুভ আয়োজনটাই না করেছিলেন প্রমাদচরণ।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে আলোর ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন তিনি। সে আলো উপচে এসে পড়ছে কত না উপন্যাসে। প্রমাদচরণের দেখানো পথ ধরে কত লেখক সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন কাহিনির। তাঁরা রচনা করেছেন নতুন নতুন উপন্যাস। যুগযুগ ধরে বয়ে চলা সময়ের স্রোতধারায় আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি কাহিনির বাগানে। আমিও কাহিনির বাগানে ফোটাতে চাই ফুল। আর ওই ফুলগুলোই হবে আমার কাহিনির এক-একটি চরিত্র। বিষয়টি অনুভব করতে পারছি বটে।

অথচ আমার কপাল! হায় একটা চরিত্রও খুঁজে পাচ্ছি না। উপন্যাস লেখার জন্য চরিত্র সাজাতে হবে। কিন্তু এসব চরিত্র পাই কোথায়? আকাশের কাছে? বাতাসের কাছে? মাটির কাছে? গাছের কাছে? ছায়ার কাছে? নদীর কাছে? ঢেউয়ের কাছে?

কে দেবে উপন্যাসের সব চরিত্র?

চরিত্র ছাড়া আমি কাহিনির বাঁধবো কিভাবে? পত্রিকা অফিসকে না করে দেব নাকি? না করলেই বা কী লাভ! নতুন কাহিনি তো আর সৃষ্টি হবে না। আবার একটা নতুন কাহিনি খোঁজার জন্য মনটা কেমন কেমন জানি করছে!

ইস! যদি পাখি হতাম! পাখি যেমন দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় আকাশের সীমানায়, উড়ে বেড়ায় কত বন-প্রান্তর, ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে, এভাবে কত কী যে দেখে—এরকম দেখার সাধ নিয়ে আমার এই মুহূর্তে পাখি হতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে উড়ে যাই। দূরে কোথাও যাই। নতুন পরিবেশের

সঙ্গে গিয়ে মিশি। ইচ্ছে করছে নতুন মানুষদের দেখি। নতুন কারোর সঙ্গে পরিচিত হই। নতুন কিছু জানি, নতুন কিছু শিখি, সেখান থেকেই আমার উপন্যাসের জন্য চরিত্র খুঁজি।

এসব ভাবতে ভাবতে কলম আর সাদা কাগজকে সঙ্গী করে কিশোর উপন্যাস লেখার জন্য মনের তরী ভাসালাম। ভাসছি আর চরিত্র খুঁজছি। চরিত্র খুঁজতে খুঁজতে কেমন একটা ঘোরের মাঝে আটকে গেলাম। দেখলাম, ঢেউ দোলানো নদী। স্রোত ভেঙে ভেঙে ১৬/১৭ বছরের এক কিশোর সুঠাম দেহে বৈঠা ঠেলছে। চোখেমুখে সাহসের ছাপ। নদীর বুকে ঢেউ ভাঙা কলকল শব্দ। একই ছন্দে একই লয়ে বেজে চলেছে।

একসময় ঝড়ে কাঁপতে থাকে নৌকা। যেন তলিয়ে যাচ্ছে জলের ভেতরে। আবার ভাসছে। ডুবছে। ডুবছে। ভাসছে। দেখলাম বালকটি সাঁতরাচ্ছে। সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত শরীরে নদীর তীরে এসে দাঁড়ায় বালকটি। খালি গা। লুঙ্গি কাছা দেয়া।

হঠাৎ আমার লেখার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় সেই বালকটি। চমকে উঠি!

'কে তুমি?'

'আমি নাগা। মাঝির ছেলে।'

'কোন্ মাঝির ছেলে?'

'পদ্মানদীর মাঝির ছেলে। আটখামার স্টিমার ঘাটে নৌকা চালাই। কাকার নাম হারু মাঝি।'

'পদ্মানদীর মাঝির ছেলে? পদ্মা ছেড়ে আমার এই রুমে কী চাও?'

'আপনার হৃদয়েও তো পদ্মা ঢেউ তুলছে। যদিও পদ্মা এখন স্রোতহীন নিশ্চুপ গোছের নদী। কেবলই সাহসী গল্পের ইতিহাস।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আমার হৃদয়েও তো পদ্মা ঢেউ তুলেছে। আমি যে লেখকেরই বানানো চরিত্র। তাইতো সব লেখকের মন বুঝি।'

কথাটা বলেই হাসতে লাগল নাগা। বলল, 'আমার ভেতরে আছে পদ্মার দুকূল জুড়ে যাদের বসবাস, যারা রিক্ত, নিঃস্ব এবং হাহাকার যাদের জীবনের

গভীরে রয়েছে সেসব না খাওয়া গরিব মানুষের সংগ্রামী জীবনগাথার নানা সংলাপ। নেবেন নাকি?'

'এই সংলাপ তোমাকে কে শিখিয়েছেন?'

'যিনি শিখিয়েছেন তাকে কি এই মুহূর্তে দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু তুমি তো জাদুকর নও, মাঝির ছেলে। তুমি কী করে পারবে? কী করে পারবে তাকে দেখাতে।'

'পারব, কারণ আমি যে তার বানানো একটি চরিত্র। অনেক মায়া দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আর কল্পনায় সাজিয়ে তিনি আমাকে তৈরি করেছেন। তিনিই তো আমার নাম রেখেছেন নাগা।'

'আমি তাকে দেখতে চাই। তার কাছ থেকে আমিও একটা চরিত্র ধার নেব।'

'খুব ভালো। আপনি যাকে খুঁজছেন আমি যে তার কথাই বলতে এসেছি।'

'কে সে?'

কিছু একটা শব্দে পেছন ঘুরে তাকাতেই দেখি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নাগাকে খুঁজছি। কিন্তু নাগা নেই বরং আচমকা রুমে চলে আসা মানুষটার দীর্ঘদেহী ছায়া দেখে একলা রুমটায় আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম।

নিজেকে ভীরু মনে না হলেও এক মুহূর্তের জন্য ভিতু মনে হল। বললেন, 'আমার কথা লিখতে চাও?'

সত্যিই তো আমাকে কারোর কথা লিখতে হবে। না হলে উপন্যাস হবে কিভাবে? আমি কি তার কথাই লিখতে চাইছি? আমার ভেতরে টানাপোড়েন তৈরি হল। উপন্যাসের চরিত্র কে হবে এই ভাবনায় আমি জটিলতায় পড়লাম।

'বল, আমার কথা কী লিখতে চাও?' আমার কাঁধে ডান হাতটা রেখে একটু ঝাঁকিয়ে কথাটা বললেন আগন্তুক মানুষটি।

ছোট্ট করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে লেখ। সংগ্রাম করা জীবনের কোনো চরিত্র দিয়ে যদি কিশোর বন্ধুদের জন্য গল্প বানানো যায় মন্দ কি! যে গল্প পড়ে কিশোর মন নাড়া খাবে, কৌতূহলী হয়ে উঠবে কিশোরের জিজ্ঞাসু মন, তাতে দোষের কি আছে?'

'আমি তো সে রকমই একটা চরিত্র খুঁজছি।'

'শরৎচন্দ্র তো মহেশ গল্পটি বড়োদের জন্য লিখেছেন। কিন্তু স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ওই গল্পটি স্থান পেয়েছে বলে আমার আনন্দের সীমা থাকেনি।'

এ কেমন একজন রহস্যময় মানুষ। শরৎচন্দ্রকে চেনেন। শরৎচন্দ্রের মহেশকে চেনেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকেও নিশ্চয়ই চেনেন। ভারী ভারী কথা বলার লোকটি তাহলে কে? কোত্থেকে এলেন? তিনি আমার চেনা কেউ? তাকে কি কোথাও দেখেছি? সাহিত্যের আড্ডায়? কিংবা কোনো ব্যস্ত শহরের মোড়ে? কিংবা কোন বটের ছায়ায়? আচ্ছা,.উনি কি লেখক? বড়ো লেখক কেউ? তাহলে আমি তাকে চিনছি না কেন? তোমরা কি চিনতে পারছ লোকটা কে? চিনে থাকলে আমায় একটু বল না? দেখি আমি তাকে চিনতে পারি কী না? আপনি কে? আপনি কি জীবিত না মৃত?

ওমা মানুষটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন—

'মৃত্যুই গড়েছে ঘর, সমাজ-সংসার
মরে মরে বেঁচে থাকা
জীবনের সেরা অহংকার!
এত যুদ্ধ, এত হত্যা, দুর্ভিক্ষ ও রোগ,
এত বন্যা, ভূমিকম্প এত,
দিনক্ষণ গোনাগাঁথা সীমাবদ্ধ আয়ু,
মানুষের এ পৃথিবী আজও তবু হয়নি শ্মশান,
মরণই তো জীবনের সেরা জয়গান!'

'ভালো। তার মানে আপনি মৃত্যুকে ভয় পান না। তাইতো মৃত্যুর জয়গান শোনাচ্ছেন?'

'মৃত্যুকে ভয় পাব কেন? মৃত্যুকে তো নাগাও ভয় পায়নি। নদীর বুকে বৈঠা ঠেলে যে নাগা পদ্মাকে বন্ধু করেছে সে নাগা নদী ছেড়ে সমুদ্রে যেতে চায়-মৃত্যুর ভয় থাকলে কি পারত?'

কোনো শব্দ না করে শুধু মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম—'না। তাহলে কি নাগা আপনার কথাই বলেছিল আমায়?'

এতক্ষণে খেয়াল করলাম মানুষটা আমার সামনে দাঁড়ানো নেই। আমি যে রুমে বসে লিখছি তার দক্ষিণের জানালার ধারে একটা বিছানা আছে